15 July, 2024

বণিক বার্তা

ড. এ কে এনামুল হক

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিকসের ডিন ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। তিনি এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ও ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের (ইআরজি) পরিচালক। এছাড়া তিনি যেসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংক, আইইউসিএন, সেভ দ্য চিলড্রেন, আইএফসি ও ইউএনডিপি। বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২৪ উপলক্ষে বাংলাদেশের তরুণদের শিক্ষা, দক্ষতা, কর্মসংস্থান, নতুন যুগের নানা চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবেলার পথ নিয়ে কথা বলেছেন *বণিক বার্তার* সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাবিদিন ইব্রাহিম**

অবকাঠামোগত উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হলেও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যথেষ্ট নয়

এক দশকের বেশি সময় ধরে দেশে উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় ছিল। কিন্তু সে অনুপাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। এর পেছনে কী কারণ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

গত এক দশকে আমরা নানা মেগা প্রকল্প সম্পন্ন করেছি। আমরা মেট্রোরেল চালু করেছি, অনেক রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করেছি। এগুলোর অবদান জিডিপিতে আছে। ফলে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন বিস্ময়কর কোনো বিষয় নয়। তবে এগুলোর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে গেলে সময় দেয়া প্রয়োজন। এসব মেগা প্রকল্পের ফলে যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঢাকা থেকে খুলনা বা অন্য অনেক জায়গায় পৌঁছানো যাচ্ছে। এর ফলে কিছু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলেও তা আমাদের অর্থনীতির আকার বিবেচনায় পর্যাপ্ত নয়। এখন প্রয়োজন বিনিয়োগ। অবকাঠামোগত উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হয় ঠিকই কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে না। অবকাঠামোগত উন্নয়নের পর যদি বিনিয়োগ না আসে তবে প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে না।

দেশ এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পথে এগোচ্ছে। অনেকে উন্নয়নশীল ও মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পর অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। দুই বছর ধরে আমরা যে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তাতে কি মনে হচ্ছে আমরা আগেই সংকটে পড়লাম? এটি আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড প্রাপ্তিতে ঝুঁকি তৈরি করছে কিনা।

দেশের অর্থনৈতিক সংকটগুলো আরো দীর্ঘদিন থাকবে বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা যে প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছি তা যদি পূরণ করতে হয় তাহলে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর প্রধান কাজ হতে হবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের কতগুলো অর্থ আছে। এক, কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়া, শিল্প উৎপাদনমুখী হওয়া। শিল্পনির্ভর হওয়ার ফলে অর্থনীতিতে ঝুঁকি বাড়ে। কারণ ধর্মঘট কারখানায়ই হয়, কৃষিজমিতে ফসল কখনো ধর্মঘটের কারণে বন্ধ করা যায় না। দুই, নগরায়ণ হচ্ছে আর তিন, যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গড়ে উঠছে। এই তিনের বিচারে যদি বলি, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর মানুষ যখন বয়স্ক হবে তখন তার পেনশন প্রয়োজন হবে এবং এটি গুরুত্বপূর্ণও বটে। এরই মধ্যে সরকার সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করেছে। এখন সরকারকে এটি সব পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে। তাহলে হঠাৎ করে আমরা আর ঝুঁকিতে পড়ব না। দ্বিতীয়ত, কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে চাই না। সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি সাহায্য পাওয়ার জন্য। অথচ সহায়তা দিয়ে উন্নয়নশীল দেশ টিকে থাকতে পারে না। তখন অনেক সুযোগ-সুবিধা রহিত করা হবে। সুতরাং প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার বিকল্প নেই। এজন্য প্রয়োজন নিজেদের উদ্ভাবন ও দক্ষ শ্রমিক। এগুলো পারস্পরিকভাবে জড়িত। মধ্য আয়ের ফাঁদে সেসব দেশ পড়েছে যারা এ তিন বিষয়ের সমন্বয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। তবে এটি কাঠামোগত উন্নয়নের জন্য হয়েছে। বাকি কাজগুলো অর্থাৎ দক্ষতা ও বিনিয়োগ বাড়ানো না গেলে আমরাও ওই ফাঁদে পড়ব। পাশাপাশি প্রয়োজন পেনশন স্কিম যেটি সরকার এরই মধ্যে চালু করেছে এবং এটি একটি ভালো উদ্যোগ। বয়স্ক জনগোষ্ঠী ও তাদের পরিবারকে এটি সুরক্ষা প্রদান করবে। মধ্য আয়ের ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি যেমন আছে, তেমনি তা কাটিয়ে ওঠার পথও আছে। সে পথেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

দেশের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ বিশেষ করে তরুণরা সুযোগ পেলেই বিদেশ চলে যাচ্ছে। তরুণদের ধরে রাখার মতো ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে পারলাম না কেন?

এটি আমি আগেও বলেছি, তরুণদের ধরে রাখতে না পারা একটি দেশের জন্য শঙ্কার বিষয়। এটি শুধু বাংলাদেশেই নয়। আমাদের প্রতিবেশী শ্রীলংকা ও ভুটানেও একই অবস্থা। ভুটানের মতো একটি সুখী দেশেও তরুণরা বাইরে যাচ্ছে। তরুণ সমাজ একটি সুন্দর জীবন তৈরি করতে দরকার আয় ও ভালো চাকরি। ভালো জীবনের পরিবেশ তৈরির জন্য দেশের সরকার ও অর্থনীতির অগ্রগতি সেদিকে ধাবিত হচ্ছে। এটা যতক্ষণ পর্যন্ত তরুণরা বুঝতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা দেশে ভয় পাবে। তাদের জন্য এ পরিবেশ তৈরি না হলে তারা মনে করবে, আমরা দেশে থেকে কী করব? তাদের জন্য দেশকে সেই স্বস্তিটা তৈরি করে দিতে হবে। আমরা সবাই চিন্তা করছি মূল্যস্ফীতি নিয়ে। কিন্তু আমি মনে করি, অর্থনীতিবিদ হিসেবে চিন্তা হওয়া উচিত ছিল বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। আমরা যদি কর্মসংস্থান সৃষ্টি না করি এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে কাজ দিতে না পারি, আর বিনিয়োগ যদি না হয় তাহলে কাজ হবে না। আমরা শুধু মূল্যস্ফীতি নিয়ে বসবাস করছে। অথচ তুরস্ক ১০ বছর ধরে ৬০ শতাংশ মূল্যস্ফীতি নিয়ে বসবাস করছে। এর পরও তুরস্কের অর্থনীতি কিন্তু উন্নত হয়েছে। এখন সামষ্টিক অর্থনীতির অনেক অর্থনীতিবিদরা চিন্তা করছেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ে যারা কথা বলে সেটা এখন ম্যাচিউর বা পরিপক্ক অর্থনীতির জন্য সত্য। আমরা এখনো ম্যাচিউর অর্থনীতি না। আমাদের অর্থনীতির প্রধান কাজ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। তারপর আমরা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যাব। আমরা জানি, অনেকেই মূল্যস্ফীতি নিয়ে বিব্রত এবং চিন্তায় আছে। এবারের বাজেটে আমরা মূল্যস্ফীতি নিয়ে কথা বলছি কিন্তু বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিয়ে কোনো কথা বলছি না। অথচ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য সরাসরি পলিসি থাকা উচিত। কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় পলিসি নিয়ে আসা উচিত ছিল। তবে স্রেফ কাজের জন্য কাজ তৈরি নয়, অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি ভূমিকা রাখতে সক্ষম এ রকম শ্রমসৃজন পলিসি দরকার ছিল।

আমাদের অর্থনীতির একটি প্রধান ভিত হচ্ছে রেমিট্যান্স। অথচ বিদেশে পাঠানো ৫৭ শতাংশ শ্রমিকই অদক্ষ। দেশের সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষ শ্রমশক্তি পাচ্ছি না কেন? দক্ষ শ্রমশক্তি পেতে আমাদের করণীয় কী?

এটি কঠিন প্রশ্ন। কারণ এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাসহ পুরো সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। আমরা এখনো ডিগ্রিটাকেই সবকিছুর মূলে নিয়ে নিয়েছি। আমি নিজে শিক্ষক হওয়ার পরও বলি, আমরা একটা বিশাল ফাঁদের মধ্যে পড়ে গেছি। বলি, কী রকম? দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান শিল্প চাইছে, আমরা একবিংশ শতাব্দীর দক্ষ কারিগর তৈরি করে দেব। কিন্তু আমরা শিক্ষকরা বসে আছি বিংশ শতাব্দীতে। আমি যেভাবে পড়ে এসেছি এবং যা পড়ে এসেছি, এখনো তাই পড়াব। আর অভিভাবকরা বসে আছেন, উনবিংশ শতাব্দীতে। বলি, কেন তারা এখনো মনে করেন শিক্ষক বাসায় এসে পড়াবে, প্রাইভেট পড়বে, পরীক্ষা দেবে এবং পাস করবে। এই যে ত্রিমুখী অবস্থা। সবাই চিন্তা করছে। কিন্তু কেউ কিছু ঠিক করতে পারছে না। কিছু করলেই হয় শিক্ষক না হয় অভিভাবক—একজন চিৎকার করছে। বলি, কেন? কারণ আমরা এত চ্যালেঞ্জ নিতে পারছি না। এ শতাব্দী বা আগামী শতাব্দীর জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার, সেই কর্মক্ষম ও সৃষ্টিশীল শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আমরা যেতে পারছি না। এখনো যে চিৎকার চেঁচামেচি করছি, সবই পরীক্ষা পদ্ধতি ফেরত আনার জন্য। এতে মুখস্থ শিক্ষা হচ্ছে, কিন্তু মুখস্থ শিক্ষা দিয়ে কোথাও চাকরি পাওয়া যাবে না। ধরুন, ইলেকট্রিশিয়ানের কথাই বলি। ইলেকট্রিশিয়ান দিয়ে যখন আমাদের বাড়িতে কাজ করাচ্ছি, সে অনেক কিছুই জানে না। আমরা দেখছি না যে, ঢাকার মতো শহরে যদি কোনো দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান না থাকে তাহলে ১০ বছর পরে বাড়ি বাড়ি আগুন ধরবে। যদিও এক্ষেত্রে দোষ দেয়া হচ্ছে, ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগছে। কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে ইলেকট্রিশিয়ানের দক্ষতার অভাব। দক্ষ লোককে তৈরি করতে গেলে আমরা সবাই মনে করছি, পাস করা মানে পরীক্ষায় পাস করা। দক্ষতা আছে কিনা সেটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তুলে ধরতে পারেনি।

বিদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো ডিগ্রি চায় না বরং দক্ষ লোক চায়। কিন্তু আমাদের অনেকেই দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। ভারত থেকে যেসব কারিগর যাচ্ছে, তারা চাকরি পাচ্ছে। অথচ আমাদের দেশের লোকজন একই ডিগ্রি নিয়ে গিয়েও তারা চাকরি পাচ্ছে না। কারণ তারা মুখস্থ করে চলে গেছে। যে কারণে তারা সেখানে কাজ পাচ্ছে না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অধঃগতির জন্য কেউ একা দায়ী নয় বরং পুরো সমাজ দায়ী। কেউ আসলে বুঝতে পারছে না, সবাই যার যার কমফোর্ট জোনে থাকতে চায়। অভিভাবকরা চায়, তার ছেলে পরীক্ষায় প্রথম হবে। কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে কোনো কিছু শিখল নাকি শিখল না—সেটা নিয়ে চিন্তা নেই। এর জন্য সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে বের হতে পারছি না। পরীক্ষা পাসের ওপর আমাদের খুব নির্ভরতা। এতে আমরা কী দেখছি? পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের জন্য মানুষ চেষ্টা করছে। পৃথিবীর কয়টা দেশ আছে যেখানে অভিভাবকরা প্রশ্ন ফাঁস করে ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেয়! এ ধরনের উদাহরণ কেবল চীন ও ভারতীয় উপমহাদেশের পরীক্ষাভিত্তিক সমাজেই রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষার জন্য নয় স্রেফ সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য এনেছি। সার্টিফিকেটের চেয়ে যদি প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের দিকে আমাদের মনোযোগ থাকত তাহলে পরীক্ষা নিয়ে এত চিৎকার চেঁচামেচি হতো না। তখন শিক্ষায় অনেক গুণগত পরিবর্তন আসত। শিক্ষার এমন অবস্থার জন্য শিক্ষকদেরও দায় আছে। তারাও তাদের কমফোর্ট জোন থেকে বেরোতে চাচ্ছেন না। আমাদের মূল সমস্যা এখানেই, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক—কেউই কমফোর্ট জোনের বাইরে যেতে চাইছে না। এটা দেশের জন্য ক্ষতিকর।

আমাদের ড্রাইভারদের কথা বলা যায়। দেশে ড্রাইভিং কোর্স পাস করে কুয়েতে গিয়ে চাকরি পাচ্ছে না। এখন সে ড্রাইভিং জানে না। কারণ আমরা এমন এক রাজধানী তৈরি করেছি যেখানে ট্রাফিক লাইট নেই। আবার ট্রাফিক লাইট থাকলেও কেউ মানবে না, পুলিশও সেটা মানাতে পারে না। ট্রাফিক আইন ঠিকমতো জানা ও মানার অভাবে পুলিশ নিজেই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাহলে এ দেশের ড্রাইভার বাইরে গিয়ে কীভাবে চাকরি পাবে?

দেশে যদি ভালো ড্রাইভার না থাকে তাহলে বিদেশে পাঠাব কীভাবে? দেশে যদি ভালো ইলেকট্রিশিয়ান না থাকে তাহলে বিদেশে পাঠাব কীভাবে? সুতরাং দক্ষ জনশক্তি তৈরি এখন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেদিকে আমাদের চিন্তা করা উচিত। পরীক্ষাভিত্তিক সিস্টেমের সঙ্গে আমি একমত নই। কারণ এটি কেবলই পরীক্ষায় পাস, দক্ষতার ছাড়পত্র নয়।

বলা হচ্ছে প্রযুক্তির হাত ধরে আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হবে। এর জন্য আমাদের তরুণ জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতি কেমন?

এ ব্যাপারে আমাদের তরুণদের অবস্থান খারাপ—এমনটা মনে করি না। কম্পিউটার সায়েন্সে যারা রয়েছে তারা কিন্তু খারাপ করছে না। আমার জানামতে, বাংলাদেশ থেকে অনেকেই বাইরে চাকরি করতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু দেশে যারা আছে তাদের দক্ষতা ও প্রস্তুতি আছে কিনা সেটা ভিন্ন জিনিস। কম্পিউটার সায়েন্সে যারা দক্ষ তারা বিদেশে চলে যাচ্ছে। দেশে চাকরি নেই। কিন্তু আমরা মেশিন লার্নিং বলি, মেশিন লার্নিং বলতে কী অর্থ সেটা তো আমরা বুঝছি না। ডাটাবেজে আমাদের কোনো প্রবেশাধিকার নেই। আমার সঙ্গে একজনের কথা হয়েছিল, সে চিন্তা করছিল বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জের ডাটা ব্যবহার করবে। সে যাচাই করে দেখেছে, স্টক এক্সচেঞ্জের সার্ভারে দুই বছরের বেশি ডাটা নেই। দুই বছরের বেশি ডাটাগুলোয় যদি অ্যাকসেস না করা যায় তাহলে তো কাজ হবে না। দেশের সাইবার সিকিউরিটি ঠিক না করলে সামনে বিপদ বাড়বে। কয়েক দিন আগে দেখলাম, মোবাইল হ্যাকিং হচ্ছে। এগুলো এখন নিয়মিত ঘটছে। এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত, এগুলো বন্ধ করা। সরকারের একটি বিশাল উদ্যোগ ছিল, প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফআইআর) অনলাইনে করা। কত লোক করে? করে না। এ ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করতে হবে। তবে ধীরে ধীরে হবে।

আমি মনে করি, শিক্ষায় পরিবর্তন আনতে গেলে আরো গোড়া থেকে আনতে হবে। সেই গোড়ার পরিবর্তন পরীক্ষাভিত্তিক হলে লাভ হবে না। কারণ বিশ্বে আমাকে প্রতিযোগিতা করতে হবে। বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে কাজ করতে হবে। তা না হলে আমার জায়গায় অন্য একজন ভারতীয় কিংবা পৃথিবীর অন্য জায়গা থেকে দক্ষ লোক চলে আসবে। আর আমরা দক্ষতা অর্জন না করতে পারলে সেটা আমরা আটকাতে পারব না।

আমার দেশে যেসব কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ রয়েছে সেগুলোর চাহিদা অনেক বেশি এবং অনেক প্রতিযোগিতামূলক। আবার তারা বাংলাদেশে বসেই প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা অর্জন করে চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। এটা তাদের জন্য যারা কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছে। আমার দেশে কতটুকু করতে পারছে, সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে। সুতরাং আমি তৈরি করে বিদেশে পাঠাতে পারব সেটা কিন্তু হচ্ছে। কারণ কম্পিউটার সায়েন্সের প্রচুর চাহিদা। এ বিষয়ে প্রচুর ছাত্র পড়াশোনা করছে। যদি তারা ভালো করে পড়াশোনা করে তাহলে বিশ্বব্যাপী ভালো চাকরি পাবে।

বৈশ্বিক ডিজিটাল সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ১০০-এর মধ্যে ৬২। মিয়ানমার, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ভিয়েতনাম ও ভুটানের পর বাংলাদেশের অবস্থান। দেশের অর্থনীতিতে ডিজিটাল খাতে অবদান বাড়াতে ও তরুণদের সক্ষম করে তুলতে আমাদের কী কী পদক্ষেপ নেয়া জরুরি?

আমি সার্বিকভাবে যেটা বুঝি, তা হলো সূচকগুলো অনেক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করে। শুধু কম্পিউটার বা মোবাইল থাকলেই যে হবে তা নয় বরং নানা ধরনের ব্যবহার থাকে। কভিডকালে বাংলাদেশ প্রযুক্তিগতভাবে (ডিজিটালি) চমৎকার কাজ করেছে, যেটা অনেক দেশ করতে পারেনি। সেটা হচ্ছে কভিডের সময় ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমের নানা ব্যবহার। তারা ফেসবুক দিয়ে অনেক কাজ করেছে, যা মানুষ চিন্তাও করেনি। কিন্তু এটা কি ডিজিটাল? এটা ডিজিটাল না। অধিকাংশ মানুষই ফেসবুকে মেসেঞ্জার দিয়ে কথা বলছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ওই পরিবর্তনগুলো না আসা পর্যন্ত এটা সমাধান হবে না।

সূচকের কথা না ভেবে দক্ষতার বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। অধিকাংশ মানুষ মোবাইল চালাতে পারে কিন্তু প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে শিক্ষিত না। কারণ তারা বুঝছে না, কি করা যাবে আর কি করা যাবে না। বিভিন্ন জায়গায় মানুষ কথা বলছে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও তারা বলার চেষ্টা করছে যে, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তারা প্রাথমিক পর্যায়ে ভালো কাজ করে। প্রযুক্তিতে আমাদের দক্ষতা নেই, সেটি বড় সমস্যা। তার ওপর দক্ষ জনশক্তি দেশ থেকে চলে যাচ্ছে। যেমন কম্পিউটার সায়েন্সেও যারা ভালো তারা কিন্তু বাংলাদেশে থাকছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এক্ষেত্রে শিক্ষা বাড়ানো না হয়, ততক্ষণ আমরা ডিজিটাল সূচকে নিচের দিকেই থাকব। অর্থাৎ সাক্ষরতার হারের মতো কেবল লিখতে ও পড়তে জানি কিন্তু বলতে পারি না। ইংরেজি শিক্ষাও যেমন, লিখতে ও পড়তে জানি কিন্তু বলতে পারি না।

দেশের মোট শ্রমশক্তির ৮০-৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। অনানুষ্ঠানিক খাতনির্ভর হয়ে আমরা কীভাবে মধ্যম আয়ের দেশ হব? আনুষ্ঠানিক খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে আমাদের কী কী পদক্ষেপ নেয়া দরকার?

আমাদের দেশের উদ্যোক্তাদের ধরে রাখা উচিত। আমরা যদি সঠিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনা দিতে পারি তাহলে তারা দেশে থাকবে। সঠিক সুযোগ-সুবিধা বলতে শুধু মুখের কথা দেয়া নয়, বিনিয়োগের পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো। বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ বাড়ানো উচিত যাতে প্রতিযোগিতা বাড়ে। বড় অংকের বৈদেশিক বিনিয়োগ ছাড়া আনুষ্ঠানিক খাত সম্প্রসারণ করা দুষ্কর। আমাদের পলিসি নিতে হবে যাতে আগামী ১৫ বছর দেশে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। এতে দেশেই দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবে। যেমন দেশের প্রথম ফ্লাইওভার (মহাখালী ফ্লাইওভার) বিদেশী প্রকৌশলীরা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে শিখে এখন দেশীয় প্রকৌশলীরাই ফ্লাইওভার বানাতে পারছেন। পদ্মা সেতু নির্মাণে বিদেশীদের সঙ্গে বাংলাদেশের লোকজনও সম্পৃক্ত ছিল। একসময় হয়তো তারা এ মানের কিংবা কাছাকাছি মানের সেতু তৈরিতে সক্ষম হবেন।

বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, রক্ষণশীল চিন্তা নিয়ে বসে থাকলে হবে না। আমাদের বাজার আছে, শ্রমশক্তি আছে; প্রয়োজন বিনিয়োগ যাতে নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়।

শ্রুতলিখন : **দিদারুল হক**